২৪ বর্ষ : ১ম সংখ্যা জানুয়ারি ২০১৫

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

সবার জন্য রইল
২০১৫ এর
শুভেচ্ছা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)

সম্পাদকীয়

এসেছে নতুন বছর ২০১৫ সাল। নতুন বছরের প্রথম দিন (১ জানুয়ারি) দিনটি আমরা সবাই ধুমধামের সাথে পালন করলাম।

বছরের প্রথম দিন হওয়ায় সবার কাছেই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবাই এই দিন থেকে সবকিছু নতুনভাবে শুরু করতে চায়। ভবিষ্যতের সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে। অতীতের দুঃখ কষ্ট ভুলে নতুন করে বাঁচার ওয়াদা করে। নতুন আশায় বুক বাঁধে। তাই নানারকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাই নতুন বছরকে বরণ করে। হাসি আনন্দের মাঝে নববর্ষ পালন করে।

আনন্দ উৎসবের পাশাপাশি আমাদের উচিত অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া। কারণ পুরোনো বছরে আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি ছিল। অনেক কিছু হয়ত করার কথা ছিল, কিন্ত করা হয় নি? কেন ভুলগুলো হয়েছে, আর কেনই বা কাজগুলো করা হয় নি। তা আমাদের ভাবা দরকার। আরো কী কী করলে জীবনটা সুন্দর হতো তাও ভাবা দরকার।

আসুন, বছরের শুরুতেই আমরা আমাদের জীবনটাকে নিয়ে একটু ভাবি। নিজের দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালনের চেষ্টা করি। দুঃখ কষ্ট ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই একসাথে কাজ করি। তাহলে সুন্দর হবে আমাদের বর্তমান। সুন্দর থাকবে আগামী জীবনটাও।

আলাপ

২৪ বর্ষ : ১ম সংখ্যা
জানুয়ারি ২০১৫

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
রাবেয়া সুলতানা
মোহাম্মদ মহসীন

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথি

অলঙ্করণ
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

ছবি: ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ইন্টারনেট।

- ইংরেজি নববর্ষ শুরুর ইতিহাস ১-২
- গল্প: বোনের জন্য ভালোবাসা ৩-৪
- কথামালা: নদী করে মোরে দিও ৫
- পাঠকের পাতা ৬
- পুরস্কার পেলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ৭
- শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার ২০১৪ ৮
- খাঁটি মধু চেনার উপায় ৯
- এসো ছবি আঁকি ১০
- তৈরি করি রস মালাই ১১
- মা সাক্ষরতা অভিযান : আমার অভিজ্ঞতা ১২
- কৌতুক ১৩
- পাঠকের আঁকা ছবি ১৪

মূল্য: ২০ টাকা

মূল রচনা

ইংরেজি নববর্ষ শুরুর ইতিহাস

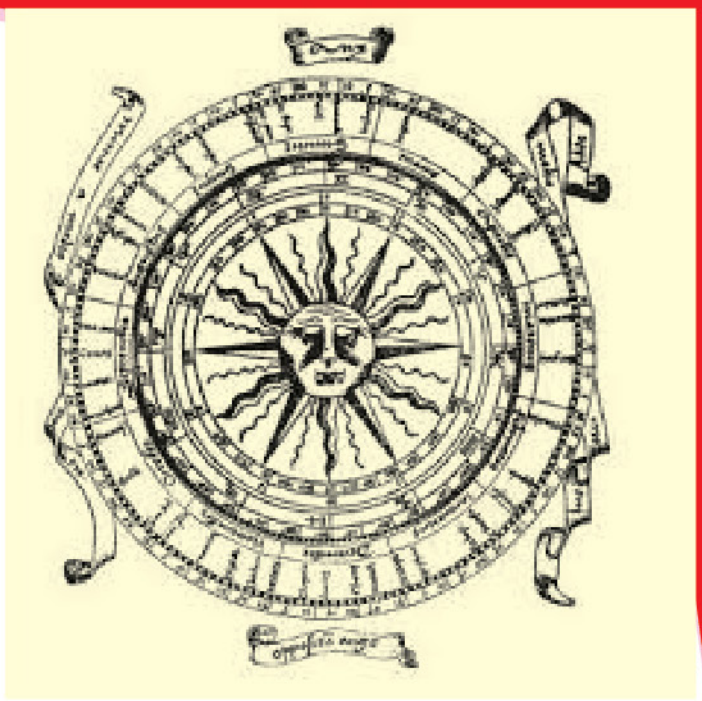

এসেছে নতুন বছর ২০১৫ সাল। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে পালন করা হয় নিউ ইয়ার বা ইংরেজি বর্ষবরণ উৎসব। সারা দুনিয়ায় সবাই মিলে এই উৎসব আমরা পালন করি। সবাই মিলে পালন করা উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো উৎসব হলো বর্ষবরণ উৎসব। হয়ত আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কবে থেকে শুরু হয়েছে এই উৎসব? এই উৎসব পালন শুরু হয় প্রায় ৪ হাজার বছর আগে। মেসোপটেমিয় সভ্যতায় প্রথম বর্ষবরণ উৎসব চালু হয়।

প্রাচীনকালে সভ্যতা যখন গড়ে ওঠে তখন মেসোপটেমিয়া নামের জায়গায় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতাকে বলা হয় মেসোপটেমীয় সভ্যতা। বর্তমান ইরাককে প্রাচীনকালে বলা হতো মেসোপটেমিয়া। সেসময় তারা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই পালন করত বর্ষবরণ। তবে সেটা কিন্তু এখনকার মতো জানুয়ারির ১ তারিখে হতো না। তখন নিউ ইয়ার পালন করা হতো বসন্তের প্রথম দিনে। তারা অবশ্য তখন চাঁদ দেখে বছর গণনা করত।

তাই উৎসব শুরু হতো চাঁদ দেখে। তাদের মতো রোমানরাও জাঁকজমক করে নববর্ষ পালন করত। তারা আবার তৈরি করে নিয়েছিল ক্যালেন্ডার। তারা চাঁদ দেখেই এই ক্যালেন্ডার বানিয়েছিল। আর ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তাদের নববর্ষ ছিল ১ মার্চ। প্রথম দিকে তাদের ক্যালেন্ডারে মাসের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০টা। জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাস ছিল না তাতে। পরে রোমান সম্রাট নুমা পন্টিলাস জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসকে ক্যালেন্ডারে যোগ করেন। তিনি ঠিক করে দেন, জানুয়ারির ১ তারিখ হবে বছরের প্রথম দিন। আর এই দিনই হবে বর্ষবরণ। কিন্তু সে কথা মানল না রোমানরা। রোমানরা আগের মতোই মার্চের ১ তারিখ বর্ষবরণ উৎসব করতে লাগল।

তাছাড়া এই ক্যালেন্ডারে সমস্যা ছিল আরও। ক্যালেন্ডারে কোনো তারিখ ছিল না। চাঁদের বিভিন্ন অবস্থা দিয়ে মাসের বিভিন্ন সময়কে চিহ্নিত করত তারা। চাঁদ ওঠার সময়কে তারা বলতো 'ক্যালেন্ডস'। আর পুরো চাঁদকে বলত 'ইডেস'। চাঁদের মাঝামাঝি অবস্থাকে বলত 'নুনেস'। পরে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার এই ক্যালেন্ডারের উন্নয়ন করেন। তিনি ক্যালেন্ডস, ইডেস, নুনেসের ঝামেলা শেষ করে বসিয়ে দেন তারিখ। এখন তো ৩৬৫ দিনে ১ বছর। তখন সেই ক্যালেন্ডারের এক বছরে মোট ৩৫৫ দিন হতো। ঝামেলা হলো বাড়তি ১০ দিন নিয়ে। আসলে তারা তখন চাঁদের হিসেবে বছরের হিসেব করেছিল।

চাঁদের হিসেব করায় তাদের বছরে ১০ দিন কম থেকে গিয়েছিল। ফলে চাষীরা পড়ল সমস্যায়। এই সমস্যার সমাধান করলেন হোঞ্চাস হেডাস নামের এক রোমান। তিনি ফেব্রুয়ারির পরে আরেকটা অতিরিক্ত মাসই ঢুকিয়ে দিলেন। তখন সম্রাট জুলিয়াস দেখলেন, অবস্থা আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। পরে তিনি এ নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করলেন। ভাবলেন, এত ঝামেলা পাকানোর দরকার নেই। চাঁদের হিসাব না করে, সূর্য দিয়ে হিসাব করলেই তো সমস্যা মিটে যায়। ব্যাস, এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তখন বছর হয়ে গেল ৩৬৫ দিনের।

জুলিয়াস সিজার তখন আবার সবাইকে বলে দিলেন, মার্চে নয়, বছর শুরু হবে জানুয়ারির ১ তারিখে। উৎসবও সেইদিনই হবে। এইবার কাজ হলো। বর্ষবরণ উৎসব মার্চ মাস থেকে চলে এল জানুয়ারিতে। এখন মনে আরেকটা প্রশ্ন জাগতে পারে। তা হলো- সেই যে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার শুরু করে গেছেন, তা এখনও চলছে? আমরা কী এখনও সেইদিনেই বর্ষবরণ উৎসব করছি! আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। যদিও আমরা জানুয়ারির ১ তারিখেই উৎসব করছি। তবে দিনটা কিন্তু এক নয়। সিজারের ক্যালেন্ডারে কিছু সমস্যা ছিল। সেই সমস্যা দূর করলেন একজন ডাক্তার। নাম তার অ্যালোসিয়াস লিলিয়াস। কিন্তু ইতিহাসে তার নাম সেভাবে কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কখনও কেউ প্রচার করে নি। আর এই ক্যালেন্ডারটির কথা সবাইকে জানান একজন পোপ। তিনি হলেন পোপ গ্রেগরি। পোপ হলেন খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান ধর্ম যাজক বা নেতা। যাকে সারা দুনিয়ার ধর্ম যাজকরা নির্বাচন করে থাকেন। তাই সবাই তাকেই চেনে। তিনি সহজেই সবার কাছে বলতে পেরেছিলেন ক্যালেন্ডারের কথা। তাই এই পোপ গ্রেগরির নাম অনুসারে ক্যালেন্ডারটির নামকরণ করা হয় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। বর্তমানে আমরা এটিই ব্যবহার করি।

এই ক্যালেন্ডারটি ইংরেজি ক্যালেন্ডার নামে

পরিচিত। এটি তৈরি হয়েছে মাত্র ৪৩২ বছর আগে। সুবিধার কারণে আস্তে আস্তে সকল জাতিই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা শুরু করে। ফলে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সবাই জানুয়ারির ১ তারিখকে নববর্ষ হিসেবে পালন করছে। এভাবেই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ১ জানুয়ারির এই বর্ষবরণ উৎসব।

গল্প

স্কুলে যাবার প্রথম দিন

মানুষের জীবনে কিছু কিছু দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরকমই একটি দিন হচ্ছে স্কুলে যাবার প্রথম দিন। আমার সেই দিনটা অন্য সবার মতো শুরু হয় নি। সেদিন ভোর হতে না হতেই মা ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। তারপর সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিলেন। ভাবলাম কোথাও হয়ত বেড়াতে যাচ্ছি। বের হবার সময় মা আমার কাধে সুন্দর একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে দিলেন। মা'কে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছি? মা বললেন, স্কুলে। মনে মনে ভাবলাম, স্কুল! শুনেছি চাচা ফুফুরা সেখানে পড়তে যায়। তার মানে আমিও তাদের মতো বড় হয়ে গেছি! আমিও আজ থেকে স্কুলে যাব। বড় বড় একটা ভাব নিয়ে মায়ের হাত ধরে স্কুলে গেলাম। দেখলাম, লম্বা লাইন ধরে আমারই মতো অনেক ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ এসেই দুষ্টামি শুরু করে দিয়েছে। কয়েকজন ভয়ঙ্কর শব্দ করে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে একটা ছেলে ডাক দিয়ে উঠল, 'মা'...! তার মা বলে উঠলেন, এই তো আছি বাবা। বাবা-মা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ। কতগুলো বাচ্চা স্কুলের মাঠে খেলছে। আমি ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখতে লাগলাম।

মাঠ পেরিয়ে মা আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে গম্ভীর চেহারার একজন বয়স্ক লোক বসে আছেন। তিনি নাকি স্কুলের বড় স্যার। দেখে মনে হলো, অনেক রাগী লোক। আমি ভয়ে মায়ের আঁচলে মুখ লুকালাম। উনি হাসিমুখে আমাকে কাছে ডাকলেন। আদরভরা কণ্ঠে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি কী কী জানি গল্পের ছলে তাও জেনে নিলেন। তারপর একজন স্যারকে ডাকলেন। এই স্যারটাও বেশ গম্ভীর চেহারার মানুষ। তার সাথে ক্লাসে যেতে বললেন। যেতে যেতে আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি কেমন কটমট করে আমার দিকে তাকালেন। ভয়ে আমি মা'কে খুঁজলাম। কিন্তু তাকে দেখলাম না কোথাও। মা রয়ে গেছেন বড় স্যারের রুমে। রাগি স্যার

আমার হাত ধরে একটা ক্লাসে নিয়ে গেলেন। সবচেয়ে সামনের সিটে বসিয়ে দিলেন।

এক সময় ক্লাসে আপা এলেন সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম জানাল। দেখে আমিও দাঁড়ালাম। তিনি সবাইকে বসতে বললেন। এরপর রোল ডাকতে শুরু করলেন। আমি বুঝলাম না, তিনি কেন এমন ডাকছেন। আমি হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। বুঝলাম, একটা সংখ্যা বললে যে কেউ দাঁড়াতে পারে। ভাবলাম, তাহলে তো আমাকেও দাঁড়াতে হবে। আবার রোল ডাকা মাত্র আমিও দাঁড়ালাম। আমার সাথে সাথে একটা মেয়েও উঠে দাঁড়াল। তাই দেখে অন্যরা হেসে উঠল। আমি তাদের হাসির অর্থ বুঝলাম না। ভাবলাম, আমি হয়ত উঠতে দেরি করে ফেলেছি। তাই সবাই হাসছে। ভাবলাম, যেভাবে পারি পরের বার আমিই সবার আগে দাঁড়াব। পরের বার রোল ডাকতেই আমি হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াতে গেলাম। এতে আমার ব্যাগের বই পুস্তক সব পড়ে গেল। এবারও আগের মতো আরেকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, উপস্থিত আপা! তাই দেখে সবাই একসাথে হো হো করে হেসে উঠল। আপা কটমট করে সবার দিকে তাকালেন। কিন্তু কেউ থামল না। আপা ভাবলেন, এভাবে তিনি পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন না। তাই তিনি জোরে ধমক লাগালেন সবাইকে। পাশের ক্লাসে সবাই বিরক্ত হতে পারে। ভেবে তিনি দরজা বন্ধ করে দিতে গেলেন। দেখে আমি তো হতভম্ব! হচ্ছেটা কি? আপা দরজাটা বন্ধ করছেন কেন? মারবেন নাকি! আমি মুহূর্তের মধ্যে ধরে নিলাম স্কুল জেলখানা জাতীয় একটা কিছু। যেখানে মানুষকে যখন তখন আটকে ফেলা হয়। আপা তখনো দরজাটা পুরোপুরি লাগাতে পারেন নি। আমি প্রায় ছিটকে বের হয়ে গেলাম ক্লাস থেকে। আমাকে এভাবে বের হতে দেখেই আশপাশের অভিভাবকরা নিশ্চয় মা'কে ডাক দিয়েছিলেন। মা'ও চলে এলেন ক্লাসের সামনে। আমি মা'কে জড়িয়ে ধরে শুরু করলাম, কান্না। মা আমাকে নানা কথায় বুঝাতে লাগল। কিন্তু আপা আমাকে সেদিন আর ক্লাসে নিতেই পারলেন না। এমন সময় আরেকজন আপা এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার হাত ধরে বললেন, আমার ক্লাসে আসবে? উনাকে আমার কেন যেন পছন্দ হয়ে গেল। তাকে বললাম, হ্যাঁ। উনি বললেন, তাহলে কাল থেকে তুমি আমার ক্লাসেই এসো। এভাবে শুরু হলো আমার স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিন।

লুৎফুন নাহার তিথি
এইচআরডি ইউনিট, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ।

আ.শ.ম. বাবর আলীর

কথামালা

নদী করে মোরে দিও

নতুন করিয়া জন্ম আমার বিধাতা দাও গো যদি,
আমারে তুমি বানাইয়া দিও বাংলাদেশের নদী।
বুকভরা পানি বুকে নিয়া আমি চলিব সুমুখ পানে,
দুর্বার গতি হবে যে আমার অজানা জানার টানে।

মোর গতিবেগ ছড়াইয়া দেবো সব মানুষের বুকে,
তারা সকলে শক্তি যে পাবে গড়িতে জীবন সুখে।
বুকেতে আমার কত কত মাছ খুশিতে করিবে খেলা,
তীরে বালুচরে ছোট ছোট পাখি বসাবে খুশির মেলা।

আমার বুকের জলে উর্বর করিব ফসল ক্ষেত,
জাগিয়া উঠিবে সারা মাঠ জুড়ে সবুজের সংকেত।
পিপাসু পথিক মোর পানি পানে শীতল করিবে প্রাণ,
ভাসাইয়া 'নাও' মোর বুকে মাঝি খুশিতে গাহিবে গান।

একুলে যদি ভেঙে যায় কারো ওকুল গড়িয়া দেবো,
সব মানুষের যত জঞ্জাল আমার বুকেতে নেবো।
সবার গাত্র করে পবিত্র দূষিত হইবো নিজে,
কষ্ট তো নয়–এমন কর্মে পুলকিত হবো কীযে!

সেই পুলকের আনন্দে বুকে তুলিব খুশির ঢেউ,
কুলুকুলু রবে করিব প্রকাশ বুঝুক- না বুঝুক কেউ।
পর উপকার কর্মটি দিয়ে হবো আমি বরণীয়,
পর জনমে বিধাতা গো তাই নদী করে মোরে দিও।

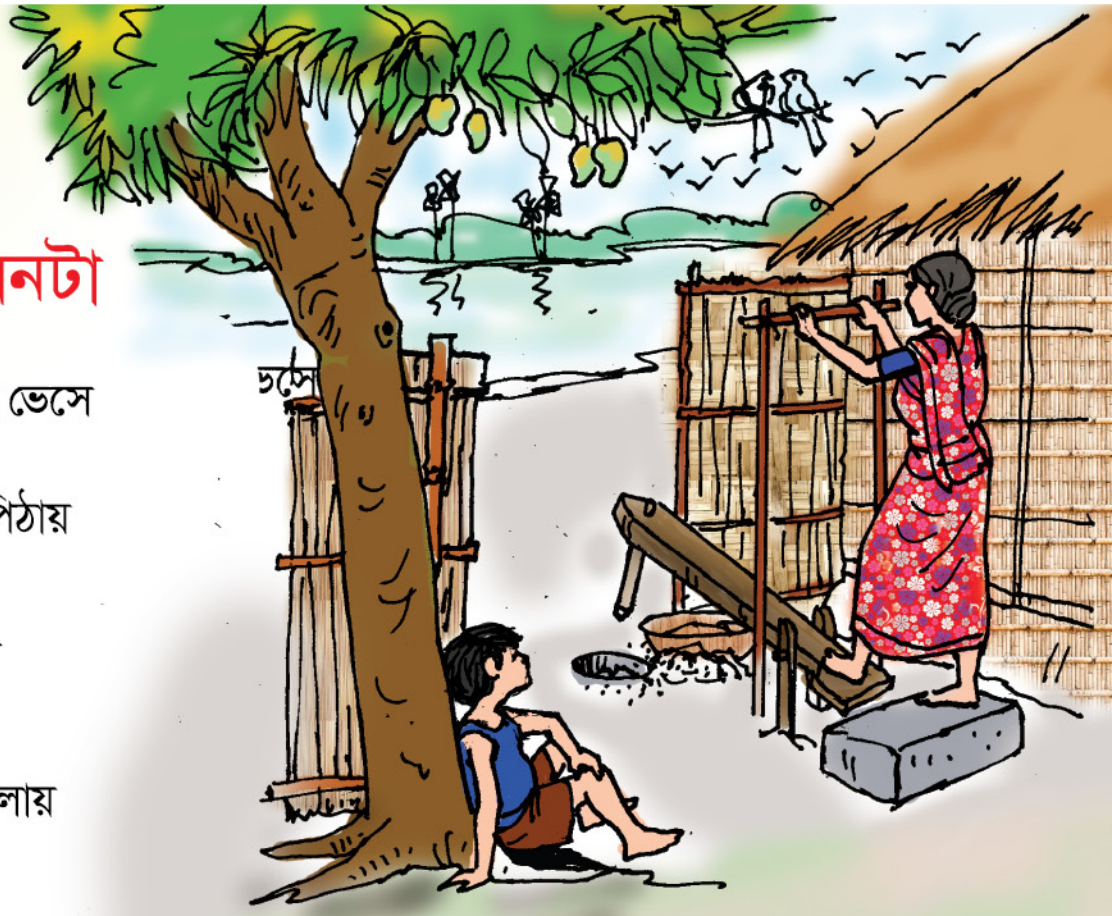

উদাস হলো মনটা

শীতের হাওয়া আসছে ভেসে
শীতের পাখি হাসছে
নতুন চালের পায়েশ পিঠায়
গন্ধ সুধা ভাসছে।

গায়ের বধু ভানছে ধান
ঢক ঢকা ঢক ছন্দে।

মনটা হারায় সন্ধ্যা বেলায়
ছাইয়ের ভূষো গন্ধে।

আম গাছের মাথায় হঠাৎ
বউ কথা কও ডাকছে।

দূরের বনে হুক্কা হুয়া
ভূত শেয়াল হাকছে।

হঠাৎ করে হিম কুয়াশায়
ঢাকল সবুজ বনটা।

তাই না দেখে ছোট্ট খোকার
উদাস হলো মনটা।

মোঃ খায়রুল ইসলাম
সুপার ভাইজার, আমতলী, বরগুনা।

হলুদ পাখি

হলুদ পাখি তোমায় ডাকি
এসো আমার বাড়ি।

বাড়ির পাশে খেজুর গাছে
বাঁধা রসের হাড়ি।

আসবে তুমি বসতে দেব
খাবে ভাপা পিঠে

সন্দেষ দেব খৈ মুড়ি আর
খেঁজুর গুঁড়ের মিঠে।

সিলা
১০ম শ্রেণি, বকুল গণকেন্দ্র, বরগুনা।

পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

পুরস্কার মানেই কোনো কাজের স্বীকৃতি বা মূল্যায়ন। এতে কাজের উৎসাহ বাড়ে। এজন্য পুরস্কার পেলে সবাই খুব খুশি হয়। আর ভালো কাজের জন্যই পুরস্কার দেয়া হয়। ভালো কাজ করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার পেয়ে আসছে। গত ২০ জানুয়ারি এরকমই আরেকটি পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। পুরস্কারটির নাম "আইসিএমএবি" শ্রেষ্ঠ কর্পোরেট পুরস্কার ২০১৪'।

কর্পোরেট ব্যবস্থাপনায় ভালো অবদান রাখার জন্য এই পুরস্কার পেয়েছে ডাম। সঠিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। ৬৬ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২য় পুরস্কার পেয়েছে ডাম। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এ পুরস্কার প্রদান করেন। ডাম এর পক্ষ হতে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জনাব কাজী রফিকুল আলম পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। ডামের অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক মহোদয়ও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আসমা বানু
সিনিয়র একাউন্টস অফিসার, অর্থ ও হিসাব বিভাগ।

শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার ২০১৪

পুরস্কার পেলে মানুষ পরবর্তীতে আরো ভালো কাজ করে। আরো বেশি কাজ করতে উৎসাহী হয়। পাশাপাশি অন্যেরাও তা দেখে অনুপ্রাণিত হয়। আর এজন্যই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) কর্মীদের কাজের প্রতিদান হিসাবে প্রতিবছর পুরস্কার প্রদান করে। এই পুরস্কারের নাম 'শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার'। যারা কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখেন তাদেরই দেয়া হয় এই পুরস্কার। ২০১৪ সালের জন্য 'শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার' পেয়েছেন জনাব মমতাজ খাতুন।

জনাব মমতাজ খাতুন আপন প্রতিভায় কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল একজন মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ডাম এ বিভিন্ন পদে কাজ করে চলেছেন। যখন যে পদে ছিলেন তাঁর দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করেছেন। শুধুমাত্র দায়িত্ব পালনই নয়, নিজের উদ্যোগেও নানা কাজ করেছেন তিনি। পাশাপাশি মিশন প্রতিষ্ঠাতার আদর্শকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বড় ভুমিকা পালন করেছেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠকও বটে। বর্তমানে তিনি প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগে কাজ করছেন। এই বিভাগের এইচআরডি ইউনিটের সমন্বয়কারী হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করছেন। অভিনন্দন জনাব মমতাজ খাতুন।

খাঁটি মধু চেনার উপায়

মধুকে সর্বরোগের প্রতিষেধক বলা হয়। রোগ নিরাময় শক্তিও রয়েছে এতে। কিন্তু আমরা অনেকেই খাঁটি মধু চিনি না। বিভিন্নভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি মধু চিনে নেয়া যায়। এজন্য একটা প্রচলিত পদ্ধতি আছে। তাহলো একটুখানি মধু দুই হাতের তালুতে নিয়ে জোরে জোরে ঘসতে হয়। এতে যদি তালু খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ওটা খাঁটি মধু। প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়া মধু চেনার আরো কিছু উপায় আছে। যেমন-

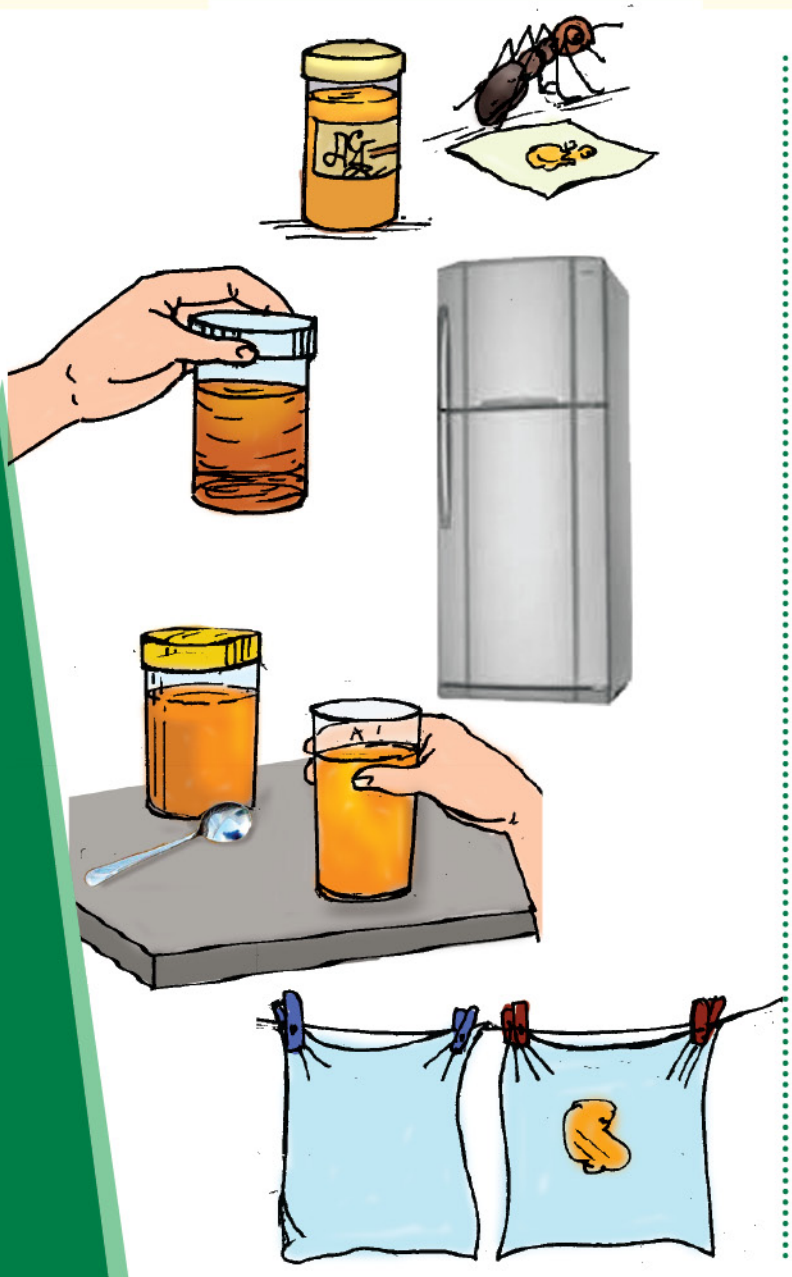

- এক টুকরা কাগজের মধ্যে কয়েক ফোঁটা মধু নিন। কোথাও ফেলে রেখে দিন। পিঁপড়া যদি তা পছন্দ করে তবে বুঝতে হবে, মধুতে ভেজাল আছে। আর পিঁপড়া মধুর ধারে কাছে যদি না ঘেসে তবে তা হবে খাঁটি মধু।
- মধুকে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিন। খাঁটি মধু জমবে না। ভেজাল মধু পুরাপুরি না জমলেও নিচে তলানী পড়বে।
- এক গ্লাস পানি নিয়ে এর মধ্যে এক টেবিল চামচ মধু নিন। খুব ধীরে ধীরে গ্লাসটি ঝাঁকান। যদি মধু পানিতে পুরাপুরি গলে যায়,তবে তা ভেজাল মধু। আর মধু যদি পানিতে ছোট ছোট গোল দানা ধরে থাকে তবে তা খাঁটি মধু।
- এক টুকরা সাদা কাপড়ের উপর সামান্য পরিমাণ মধু নিন। কিছুক্ষণ পর কাপড়টি ধুয়ে ফেলুন। কাপড় ধোয়ার পর যদি কোনো দাগ থাকে, তবে এই মধু ভেজাল মধু। আর যদি কোনো দাগ না থাকে তবে তা খাঁটি মধু।

এসো ছবি আঁকি

আমরা অনেকেই ছবি আঁকতে পারি না। আঁকাআঁকি কাজটা একটু কঠিনই মনে হয়। কিন্তু যদি চেষ্টাই না করি, তবে কঠিন কাজ কি আর সহজ হবে? তার চেয়ে বরং আমরা কয়েকটি ধাপে আঁকার চেষ্টা করি। তাহলে আঁকাআঁকি কাজটি আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে। আজ আমরা কয়েকটি ধাপে পেঁচার ছবি আঁকা শিখব।

পেঁচা আঁকার নিয়ম

- কাগজের উপর দিকে একটি ছোট দাগ বা রেখা আঁকব। এর দুই পাশ থেকে দুটি দাগ নিচের দিকে টানব। আর এই ছোট দাগগুলো একটু বাঁকা করে ভেতর দিকে ঢুকিয়ে আঁকব।

- এবার দুইটা ছোট বৃত্ত বা গোল দাগ দিতে হবে। ঠিক বাঁকা রেখাগুলোর নিচেই। তবে বৃত্ত দুইটি পুরোটা আঁকা যাবে না। দেখে মনে হবে যেন এটি একটি চশমা।

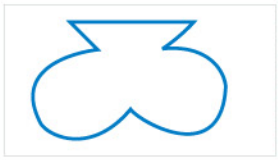

- এবার আমরা চশমার ভিতরে দুটি চোখ আঁকব। এজন্য বড় বৃত্তগুলোর ভিতরে আরও দুইটিকরে বৃত্ত আঁকব। একদম ভিতরের বৃত্তটিকে পুরোপুরি কালো করে দেব। হয়ে গেল পেঁচার চোখ।

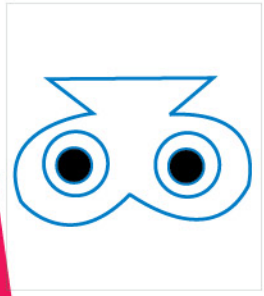

- এবার ঠোঁট আঁকার পালা। বৃত্তদুটি মাঝখানে সোজা একটা দাগ দেব। এরপর মাঝের লম্বা দাগের দুই পাশে দুটি বাঁকা দাগ দেব।

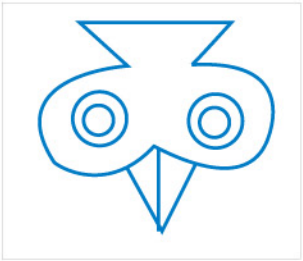

- এবার চোখের দুইপাশে থেকে দুটি লম্বা পাতার মতো করে পাখা আঁকব। আর পেঁচার পাখা ঢেউ ঢেউ দাগ দিয়ে নকশা করে নিব।

- দুই পাশের পাখায় একটার সঙ্গে আরেকটি লাইন টেনে জুড়ে দিলেই হয়ে যাবে পেঁচার পেট। এখন পেটের মধ্যে অর্ধেকের চেয়ে একটু বড় আরেকটা উল্টো বৃত্ত আঁকব। এবার পেটের নিচে লম্বা দুটো দাগও দেব। এই দাগই হবে পেঁচার ঠ্যাং। এবার তাকিয়ে দেখুন, হয়ে গেছে আমাদের পেঁচা। পেঁচার ছবি বাচ্চাদের জামায় এঁকে ভরাট সেলাই করা যায়। তাহলে দেখতে খুব সুন্দর হয়।

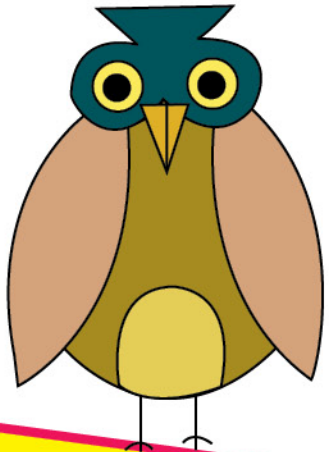

তৈরি করি রস মালাই

মিষ্টি আমাদের অনেকেরই খুব পছন্দের খাবার। আর ছোটদের বেলায় তো কথাই নেই। তারা সবাই মিষ্টি খেতে পছন্দ করে। শিশুরা যখন তখন বায়না ধরে মিষ্টি খাওয়ার জন্য। তাদের বায়না থামাতে বেশিরভাগ সময় আমরা বাজার থেকে মিষ্টি কিনে থাকি। বাজারে নানা ধরনের মিষ্টি পাওয়া যায়। রস মালাই তার মধ্যে একটি। ইচ্ছে করলে আমরা ঘরে বসে এই মিষ্টি বানাতে পারি। তাহলে শিশুরা চাইলেই যখন তখন বানিয়ে দেয়া যাবে।

এজন্য যা যা লাগবে-

- তরল দুধ- ১ লিটার
- গুঁড়ো দুধ- ১ কাপ
- ডিম- ১ টি
- ঘি বা তেল- আধা চা চামচ
- বেকিং পাউডার- আধা চা চামচ
- চিনি- পছন্দ অনুযায়ী
- দারুচিনি ১ টুকরা, এলাচি- ২/৩টি

যেভাবে তৈরি করতে হবে

প্রথমে একটি পাত্রে দুধ, দারুচিনি, এলাচ ও চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। ১ লিটার দুধকে জ্বাল দিয়ে আধা লিটার করতে হবে। অন্য একটি পাত্রে ডিম ভালো করে ফেটে নিতে হবে।

এবার আরেকটি পাত্রে গুঁড়ো দুধে ঘি ও বেকিং পাউডার নিন। এরপর ভালো করে মেশান। ঘি না থাকলে তেল ব্যবহার করা যাবে। এবার ফেটানো ডিম একটু একটু করে গুঁড়ো দুধে ঢালতে হবে। আলতো করে মেশাতে হবে যাতে নরম খামির হয়। এবার হাতে তেল মেখে সামান্য খামির নিয়ে ছোট গোল গোল মিষ্টি বানান। এরপর ফুটন্ত দুধের মধ্যে দিয়ে দিন। সাথে সাথে মিষ্টি ফুলে উঠবে।

৫ মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

মায়ের পড়ালেখা

মা সাক্ষরতা অভিযান

সচেতনতা বাড়াতে পথনাটক

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) হাতে নিয়েছে এক মহৎ উদ্যোগ। এই উদ্যোগটির নাম 'মা সাক্ষরতা অভিযান'। এভাবে নিরক্ষর মায়েদের পড়ালেখা শিখিয়ে সাক্ষর জাতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ডাম। মা ও সন্তানের ভালোবাসার বন্ধন এই অভিযানের মূল শক্তি। পড়ালেখা জানা সন্তানেরা তাদের নিরক্ষর ও স্বল্প সাক্ষর মায়েদের পড়ালেখা শেখাতে সহযোগিতা করবে।

এই অভিযানকে সফল করতে ডাম নানা ধরনের সচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তারই একটি হলো 'পথনাটক'। যেকোনো বিষয়ে মানুষকে আগ্রহী করতে এই পথ নাটকের জুড়ি নেই। পথনাটকের জন্য কাজ করছে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগের সামাজিক উন্নয়ন ইউনিট। এজন্য এই ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রথমে নাটকের দল গঠন করা হয়। এরপর তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে নাটক লিখে নাট্যদলের মাধ্যমে এলাকায় সচেতনতা গড়ে তোলা হয়। 'মা সাক্ষরতা অভিযান' এর উপর এরকমই একটি পথনাটক তৈরি করেছে এই ইউনিট। এ নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় মা সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। কীভাবে সন্তান তার মাকে পড়ালেখা শিখতে সাহায্য করবে তাও দেখানো হয়েছে। আশা করা যায়, এভাবে আনন্দ লাভের মাধ্যমে এ বিষয়ে সবার মধ্যে এক সময় সচেতনতা গড়ে উঠবে।

কৌতুক

সাগর, নদী ও ছোটনদী

একজন লোকের সঙ্গে আরেকজনের তর্ক হচ্ছে। একজন বড়াই করে বলল, আমি প্রচুর পানি পান করতে পারি। বেশি বড়াই করতে গিয়ে সে বলল- তুমি কি জান, আমি পুরো সাগরের পানি পান করে ফেলতে পারি! শুনে অপরজন বলল, মিথ্যা বলো না। কিছুতেই তুমি এ কাজ করতে পারবে না।

তখন সে বুঝল বড়াই করতে গিয়ে কী ভুল করে ফেলেছে। ভুল সারার জন্য চালাকি করে সে বলল, কেন পারব না। নিশ্চয়ই পারব। এসো, বাজি ধরা যাক। এক হাজার টাকা বাজি। তুমি এই টাকা দিলে আমি পুরো সাগরের পানি পান করতে পারব।

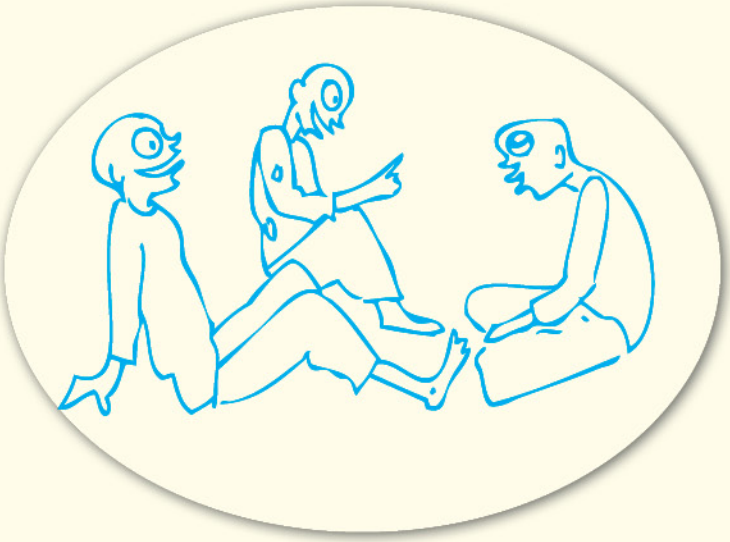

তখন অপর লোকটি ভাবল, এটা তো কিছুতেই সম্ভব নয়। সেও মনে মনে একটা চালাকি আটল। বলল, ঠিক আছে, কাল আমি তোমাকে এই টাকা দিব। সাথে কয়েকজন সাক্ষীও আনব। তবে তুমি যদি সাগরের সব পানি খেতে না পার তবে এর দ্বিগুণ টাকা আমায় দিতে হবে।

পরদিন সকালে সবাই মিলে সেই লোকটির কাছে এসে হাজির হলো। সবাই বলল,কী হে শর্ত মনে আছে তো! যাও সাগরের পানি পান করে দেখাও। নইলে এক হাজার টাকা দাও। যে পানি পান করতে চেয়েছে সে ছিল খুবই চালাক। তখন সে বলল, আমি বলেছিলাম সাগরের পানি পান করব। কিন্তু নদীর পানি পান করব তাতো বলি নি! তোমরা সবাই বড় নদী ও ছোট নদীতে বাঁধ দাও। যাতে এর পানি সাগরে না পড়ে। তবেই আমি সাগরের সব পানি পান করব। সবাই ভাবল, কথা তো সত্যিই! সবাই মজা পেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। তখন কারো টাকাই আর খরচ করতে হলো না।

পাঠকের আঁকা ছবি

ছবিটি এঁকেছেন:

সাখাওয়াত

হাজি আনুমিয়া এলসি (৮১৬)
পর্যায় অগ্রগামী, দূর্গাপুর,
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

ছবিটি এঁকেছেন:

রুবাবা আফনান

রোল-৯, ইসমাঈল, মিস্ত্রী
বাড়ি সিএলসি,
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

এখন থেকে আলাপ নিয়মিত ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...
www. ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP- Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission